ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪১/No. 41
অগ্রহায়ণ ১৪১৩/December 2006

উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমস্যা : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ*

Abstract: *The concept of local self government is an evaluated concept from local government while the first one is an authority elected by a locality voters and the second one is an appointed controlled agent for a certain administrative unit of a central government. Local government units are usually designed and established to reach services-facilities to the peripheral people on behalf of a central government while local self government units can perform development activities on an autonomous status recognized by the central government. Upazilla Parishad is an unique local self government of administrative decentralization introduced in Bangladesh in 1985 and the third election of this body is held on January 22, 2009 after a non-existence of 18 years. Meanwhile there is a debate is raised on the authority and coordination of practice of powers between the local MP and Upazilla Parishad Chairman. The concerned legal framework does not have answers on many questions so far the questions to establish a strong and effective local self government is concerned. This article would deal with the questions raised in this regard and would offer some possible suggestions to solve the problems concerned.*

ভূমিকা

তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা এক অপরিহার্য উপাদান। পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই রয়েছে যেখানে গণতন্ত্র সুসংহত অথচ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার উপলব্ধি থেকে সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নে অংশগ্রহণ হোক অথবা উন্নয়ন বরাদ্দে দুর্নীতির অভিপ্রায়েই হোক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের বিকাশে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারই কাঙ্ক্ষিত মনোযোগ দেয়নি। যার ফলে স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় চার দশক এবং সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দু'দশক পরও আজ অবধি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সত্যিকার অর্থে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা জনগণের দ্বারা কার্যকর অর্থে নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। যদিও এটা সত্য যে, সর্বস্তরের নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক উপরিকাঠামোর খুঁটিস্বরূপ। এ খুঁটিবিহীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। এ ছাড়া সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত সরকার। অধিকন্তু, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণের বিষয়টি অধিকাংশ উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও, মিডিয়া, নাগরিক সমাজ এবং রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্ব সহকারে দেখছে। এরই প্রেক্ষিতে ড. ফখরুদ্দিন

* প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, রাজশাহী।

আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ এর জুন মাসে সাত সদস্যের 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ' কমিশন গঠন করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ২০টি পরামর্শ সভা ও কয়েক শত লিখিত সুপারিশ পর্যালোচনার ভিত্তিতে কমিটি গত ১৩ নভেম্বর, ২০০৮ প্রধান উপদেষ্টার নিকট চার খণ্ডের রিপোর্ট পেশ করে, যার মধ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত সমন্বিত খসড়া আইন অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৮ মূলত ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগের গঠিত কমিটি ও ১৯৯২ সালে বিএনপি'র গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।[১] প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পরবর্তীতে ২২ জানুয়ারী ২০০৯ এ শেখ হাসিনার নির্বাচিত সরকারের অধীনে তৃতীয় উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৮ বছর পর স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এ স্তরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। জন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে তাই স্থানীয় এ সরকারের কার্যকর ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই।

দুই. উদ্দেশ্য

ক) স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের কাঠামো ও কার্যগত ক্ষমতার অতীত এবং বর্তমান পরীক্ষা করা,

খ) উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের ভারসাম্যহীনতা পরীক্ষা করা,

গ) এ বিষয়ে নাগরিকজন, মিডিয়াকর্মী, উন্নয়নকর্মী, আমলা এবং জনপ্রতিনিধিদের মনোভাব জানা ও পরীক্ষা করা,

ঘ) উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যের আইনী ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সমন্বয়হীনতার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করা, ও

ঙ) উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের আইনী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধনের সম্ভাব্য কৌশল ও কর্মধারাসমূহ চিহ্নিত করা।

তিন. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপাত্ত এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য মাধ্যমিক সূত্র অর্থাৎ সংবাদ পত্র, প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম ও সরকারি দলিলাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

চার. ধারণাগত কাঠামো

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার, উপজেলা চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ পরিভাষার প্রয়োগ থাকবে। এখানে মূলত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিষয়ে ধ্রুপদী ও প্রায়োগিক সংজ্ঞার বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হবে।

স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ধারণা দু'টি যথেষ্ট প্রাচীন এবং ব্যাপকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। যদিও একই সাথে এ দু'টি ধারণাকে ব্যাপকভাবে সমার্থক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ অসঠিক প্রয়োগ বাংলাদেশের (এবং আরো কিছু দেশের) গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দলিলেও দেখতে পাওয়া যায়। বাহ্যত এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে

যে, স্থানীয় সরকার হলো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো, যা নিঃশর্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য করে। আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হলো স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক ভোটার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থাপনা, যা রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিধানের আওতায় নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে স্থানীয় বিষয়াদির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে।

উপজেলা চেয়ারম্যান বলতে বাংলাদেশের অন্যতম প্রশাসনিক একক উপজেলা এলাকার নাগরিক-ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বোঝানো হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের জন্য চিহ্নিত ৩০০টি সাধারণ নির্বাচনী এলাকার কোনোটির আওতাধীন নাগরিক ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সংসদ সদস্য বলা হয়। একটি ভিন্ন ও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদের 'সংরক্ষিত নারী আসনে' নির্বাচিত ব্যক্তিগও অবশ্য সংসদ সদস্য হিসেবে গণ্য।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং কিছুমাত্রায় বিতর্কিত দু'টি পরিভাষা। ক্ষমতার সাথে প্রভাব-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Laswell ও Kaplan সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা ও প্রভাব এর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। ক্ষমতা-র ক্ষেত্রে তারা অন্যের আচরণ পরিবর্তনের জন্য তুলনামূলকভাবে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গভীর বঞ্চনা এবং প্রশ্রয়ের ব্যবহারের কথা বলেছেন।[২] তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট একগুচ্ছ বিধানের আওতায় অধিকারসমূহই ক্ষমতা।

সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক দর্শনে কর্তৃত্ব কথাটি ক্ষমতা, প্রভাব এবং নেতৃত্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দার্শনিক De Jouvenel Bertrand-এর মতে, 'কর্তৃত্ব ধারণাটি রাষ্ট্রের ধারণার চেয়ে পুরাতন এবং মৌলিক।[৩] সনাতন নিয়মে কর্তৃত্বকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। কর্তৃত্ব বলতে আইনানুগ ও ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা, আদেশ দেয়ার ক্ষমতা বা কোনো কাজ করার অধিকারকে বুঝায়।

প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্বের অর্থ হচ্ছে অন্যকে আদেশ করার ক্ষমতা। সংগঠনের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একজন ঊর্ধ্বতন প্রশাসকের আদেশানুযায়ী একজন অধস্তন কর্মচারী কাজটি সম্পাদন করে। দায়িত্বের ভিত্তিমূল হচ্ছে কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় না। সংগঠনকে একত্র করার সক্রিয় শক্তি হচ্ছে কর্তৃত্ব। সংগঠন মানেই ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতম প্রশাসনের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ সমন্বয়ের মূল উৎস নিহিত রয়েছে কর্তৃত্বের মধ্যে। পিফনারের মতে, 'কর্তৃত্ব হচ্ছে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা'।[৪] প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনে কর্তৃত্ব স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতার ব্যবহার বা প্রয়োগ বুঝায়। তবে এ ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে প্রয়োগ নয়।

বর্তমান গবেষণাকর্মে সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান এর যাবতীয় আইনানুগ ও আনুষ্ঠানিক অধিকারকে কর্তৃত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর ব্যক্তির সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান এর পদে বিদ্যমান থাকার সূত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনানুষ্ঠানিক ও অঘোষিত যে সামর্থ্য চর্চা করেন ও করতে পারেন তাকে ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাঁচ. সীমাবদ্ধতা

প্রথমত; উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি নির্বাচনের মাধ্যমে সবেমাত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পর্যাপ্ত অনুশীলন পর্যবেক্ষণের সুযোগ না থাকায় এ বিষয়ক মূল্যায়ন- পরামর্শমালা ফলপ্রসূতার বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

দ্বিতীয়ত; ক্ষুদ্র পরিসরে এ গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণালব্ধ ফলাফল সাধারণীকরণে অপর্যাপ্ত বিবেচিত হতে পারে।

ছয়. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে যে সংবিধান রচিত হয়েছে তাতে স্থানীয় সরকার বা স্থায়ী শাসন বিষয়ে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও বিধান ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের সংবিধানে এ সংক্রান্ত ৪টি অনুচ্ছেদ- ৯, ১১, ৫৯, ৬০ আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯-এ সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান এবং এগুলোতে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১১- তে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনগণের কার্য র অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ দু'টি অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার-প্রদান করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য পরিচালনা, জন শৃঙ্খলা রক্ষা, 'পাবলিক সার্ভিস' বা জনকল্যাণমূলক সেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্থানীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপরই স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন পরিচালনা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম তথা 'স্থানীয় শাসন' পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অনুচ্ছেদ ৬-এ স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। তবে সংসদ আইনের দ্বারা অন্যান্য ক্ষমতা এবং দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করতে পারে।[৫] কিন্তু কুদরত-ই এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ মামলার রায় অনুযায়ী, 'সংসদ স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধানে ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদকে উপেক্ষা করতে পারে না।[৬] এছাড়াও ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে আদালতও সরকারকে এগুলো পালন করতে বাধ্য করতে প র।

ভারতসহ অনেক দেশের সংবিধানে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বিধান যখন অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন এ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল। কুদরত-ই এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিজ্ঞ বিচারক মোস্তফা কামাল বলেন, যে, বাংলাদেশ সংবিধানের একটি অন্যন্য বৈশিষ্ট্য হলো, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম এসব সমন্বিত স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেছে।[৭]

সাত. উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্কের পটভূমি

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে গঠিত ও পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের আইন পরিষদের তৈরি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হয় এ প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন এবং বিধিমালা তৈরীর মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের গঠন, আর্থিক সংস্থান ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর, ফি ও টোল আরোপ এবং আদায় করতে পারে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এক অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উপযোগী ব্যবস্থাপনা।[৮] এ ছাড়া স্থানীয় আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে এটি একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত এবং নন্দিত। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি স্থানীয় স্বশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের ইতিহাস মোটেও প্রাচীন নয়। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের পর উপজেলা পর্যায়ে 'থানা কাউন্সিল' গঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ৭ নং আদেশ দ্বারা উক্ত থানা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের গুণগত পরিবর্তন করে থানাকে উপজেলা হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিষদ করা হয়। এতে করে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্বশাসনের শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের আলোকে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট রহমতুল্যা কমিটির সুপারিশের আলোকে পুনরায় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে উপজেলা নামকরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ আইন প্রবর্তিত হয়।[৯] পরবর্তীতে বাংলাদেশের সদ্য বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারিকৃত (২০০৮ সালের ১২ মে)[১০] অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে তিন স্তর বিশিষ্ট নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। স্তরগুলো হলো ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা। 'সাবসিডিয়ারিটি তত্ত্বের' আলোকে ওপরের স্তরগুলোর দায়িত্ব হবে সীমিত। এ তত্ত্বের মূল কথা হলো, সর্বাধিক নিম্নস্তরের সরকারের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক এবং যে সব সমস্যা নিম্নের স্তরে সমাধান সম্ভব নয়, কেবল সেগুলোর দায়িত্বই ক্রমাগতভাবে ওপরের স্তরে অর্পিত হবে। এখনও জেলা পরিষদ কার্যকর হয়নি। সুতরাং বিদ্যমান দুই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যে বর্তমানে উপজেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের (ইউপি) মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে উপজেলা পরিষদের কার্যকারিতা প্রশ্নে ঘনিভূত সন্দেহের কথা আলোচিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইনে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকার উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করার বিধান ছিল। পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৮ (৩২ নং অধ্যাদেশ) -এ উপজেলা পরিষদ

আইনের (১৯৯৮) মধ্যে বেশ কিছু গুণগত পরিবর্তন করা হয়।[১১] এ অধ্যাদেশে সংসদ সদস্যদের উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা থাকার বিধানটি রহিত করা হয়। কিন্তু ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে বলে মিডিয়াতে জানানো হয়। আর এ চিন্তাভাবনা কার্যকর করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জারি করা উপজেলা অধ্যাদেশ সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়। এ প্রসঙ্গে বর্তমান স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, সাংসদরা নির্বাচনী প্রচারের সময় এলাকার উন্নয়নে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকরী সহযোগিতার কথা সরকার ভাবছে।[১২] স্থানীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের কার্যালয় হিসেবে উপজেলা পরিষদ ভবন ব্যবহারের কথাও আলোচিত হয়। একই ভবনে দু'জন জনপ্রতিনিধি থাকলে কাজের ক্ষেত্রে সমস্যার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। উপজেলা পরিষদের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যায় পড়তে পারেন কি-না তা-ও বিবেচনা করা হয়।[১৩] এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিতর্ক এড়াতে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে সাংসদের অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে। সাংসদদের সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যানের কাজের সমন্বয় করাই হবে নতুন সরকারের জন্য বড় পরীক্ষা এমনটি কেউ কেউ দাবি করছেন। স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করাও সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।[১৪] নবগঠিত (২০০৮) স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ মনে করেন, সাংসদদের সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যানদের সম্পর্কটা দ্বন্দ্বের না হয়ে সমন্বয়েরও হতে পারে যদি তারা উভয়ই এলাকার উন্নয়ন চান। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, সাংসদদের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক হবে সহায়ক, বিরোধের নয়। লুটপাট করতে না চাইলে এ ধরনের সংকট হয় না।[১৫] সরকার উপজেলা পরিষদ এবং সাংসদদের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তৎপর বলে ধারণা দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার স্থানীয় সরকার কমিশনের সাথে আলোচনা করেছে। সরকারের আশঙ্কা উপজেলায় আইনী কর্তৃত্ব না থাকলে সাংসদদের পক্ষে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু উপজেলা চেয়ারম্যান এবং সাংসদদের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় হতে পারে এ ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনো প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কমিশন এখনো দেয়নি। কমিশনের পক্ষ থেকে সাংসদদের জেলা পরিষদে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কমিশনের মতে, স্থানীয় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কোনো সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারে না।[১৬] স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্ন নামে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে উদাহরণ দিয়ে বলেন, ভারতের সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নে বছরওয়ারী বাজেট দেয়া হয়।[১৭] নাগরিক সমাজ এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অবশ্য এ ব্যাপারে বিরোধিতাও আসছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে সুপারিশ প্রণয়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গঠিত কমিটির সভাপতি ড. এএমএম শওকত আলী বলেন, উপজেলায় সাংসদদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হলে উপজেলা পরিষদ আগের জায়গায় ফিরে যাবে এবং উপজেলার নিজস্ব প্রকৃতি থাকবে না। তবে স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, যেহেতু উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাংসদ একই ভোটার দ্বারা নির্বাচিত, তাই উভয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় থাকা দরকার। বিধি প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন বড় ধরনের উন্নয়নসহ পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণকালে সাংসদদের পরমার্শ প্রয়োজন হবে। কমিশন বিধি দ্বারা এ রকম ক্ষেত্রে

সাংসদদের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে দিতে পারে। তবে তিনি আইনগতভাবে কোনো কর্তৃত্ব প্রদানের বিরোধিতা করেন। টিআইবি-র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, গোঁজামিল দিয়ে কাজ হয় না। সংবিধানে সাংসদদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট আছে। সেগুলো তারা ভালোভাবে করতে পারেন। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। সেখানে সাংসদদের কর্তৃত্ব দেয়া হলে স্থানীয় সরকারের স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ন হবে। তিনি মনে করেন, ভারতের মতো সাংসদদের টাকা দেয়া হলে তা দিয়ে কি প্রকল্প নেয়া হয় এবং কি কাজ হয় তাও যাচাই-বাছাই হওয়া উচিৎ।[৮] বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব আইন প্রণয়ন। তাই স্থানীয় উন্নয়ন কাজে তাদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়বে বলে দাবি করা হয়। ১৯৮৫ সালে উপজেলা পরিষদ চালু হওয়ার পর ১৯৮৬ সালে সাধারণ বা তৃতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। এ সংসদে সাংসদদের উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে কর্তৃত্ব দেয়া হয়। এর ফলে উপজেলায় চেয়ারম্যানদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। স্থানীয়ভিত্তিক প্রশাসন সাংসদদের কথা শুনবে না চেয়ারম্যানদের কথা মানবে, তা নিয়েও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় বলে দাবি করা হয়। তিক্ত এ অভিজ্ঞতার কারণে পরবর্তীতে কোনো সরকারই উপজেলা পরিষদ কার্যকর করতে বাহ্যত আন্তরিক ছিল না। এরশাদ প্রবর্তিত এ ব্যবস্থাটি ১৯৯১ সালে বিএনপি কর্তৃক বাতিল করে দেয়া হয়।[৯] ১৯৯৫ সালে তৎকালীন সচিব হাসনাত আব্দুল হাই-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি উপজেলা নির্বাচন করার পক্ষে সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার উপজেলা আইন সংশোধন করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ক্ষমতা সরকারের হাতে নেয়। ফলে নির্বাচন কমিশন একাধিকবার উদ্যোগ নিয়েও এ নির্বাচন করতে পারেনি। যদিও ৬ এপ্রিল ২০০৯ এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দাবি করেন আওয়ামী লীগ ১৯৯৮ সালে উপজেলা নির্বাচন করতে চেয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে এ সংক্রান্ত বিষয় প্রস্তাব দিলেও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের বিরোধিতার কারণে ঐ সময় নির্বাচন হতে পারেনি।[১০] এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতির বক্তব্য না পাওয়ায় মন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই সম্ভবপর নয়। ২০০১ সালে আবার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উপজেলা পরিষদের ভাগ্য নির্ধারণে মন্ত্রীসভা কমিটি ও একাধিক উপকমিটি গঠন করে। কিন্তু উপজেলা পরিষদে সাংসদদের কর্তৃত্ব নির্ধারণ প্রশ্নে এ সব কমিটিতে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে কমিটি চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। এ কমিটির সদস্য তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা উপজেলা নির্বাচনের সরাসরি বিরোধিতা করেন। বলেন, উপজেলা নির্বাচন করা হলে সাংসদদের সঙ্গে চেয়ারম্যানদের ঝগড়া হবে।[১১] এতে দলের ক্ষতি হবে। এভাবে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং উপজেলা ব্যবস্থার প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের এ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটি দীর্ঘ সময় অবহেলিত থেকেছে। ১১ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার[১২] উপজেলা পরিষদকে পুনর্বহাল এবং বাস্তবায়িত এর অনুকূলে অধিক ক্ষমতা প্রদান করে অধ্যাদেশ জারি করে। বর্তমান অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে একজন নারীসহ দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান ও একটি সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাভুক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উপজেলা পরিষদের অধীনে দেয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা (ইউএনও) ও প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়া অন্য সব কর্মচারীকে শৃঙ্খলাজনিত অপরাধে বরখাস্তের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে চেয়ারম্যানকে। ইউএনও'র বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) লিখবেন উপজেলা চেয়ারম্যান। আর ইউএনও এসিআর লিখবেন তার অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের।[২৩] এ আইনটিতে উপজেলা চেয়ারম্যানদের একক ক্ষমতার বিধান রাখা হয়েছিল এবং সাংসদদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়েছিল। ইউএনও'র ক্ষেত্রে আইনটি যথেষ্ট অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিযুক্ত আমলাতন্ত্রের তথা ইউএনও-র সঙ্গে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের কিছু ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা এবং দায়িত্বে অবহেলার বিষয়ে অন্যদের ওপর পরিষদের কর্তৃত্বের ক্ষমতা থাকলেও ইউএনও'র ওপর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কর্তৃত্ব না থাকার বিষয়টি এমন বিভ্রান্তি ও দ্ব্যর্থবোধকতার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সাংসদ বনাম উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয়ের যে সমস্যা বর্তমানে আলোচিত হচ্ছে তেমনি উপজেলা চেয়ারম্যান বনাম স্থানীয় আমলাতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যাও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এটি ভবিষ্যতে পরিষদের কাজে কর্তৃত্বের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আট. শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা

মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী ইতিমধ্যেই আলোচিত-সমালোচিত এ ইস্যুতে সংসদ সদস্যদের পক্ষে সরকারের অবস্থানের বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠে। উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যরা যে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব ফিরে পাচ্ছেন সে ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২৪] গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে পাস করা উপজেলা পরিষদ আইনের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবে। সদ্য বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ সংক্রান্ত জারীকৃত অধ্যাদেশে পরিষদে সাংসদদের এ ধরনের উপদেষ্টা রাখার বিধানটি বিলুপ্ত হয়েছে। সদ্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের উপজেলা পরিষদের ওপর সাংসদদের এ ধরনের কিংবা কোনো ধরনের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশটির পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিকাশে নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন।[২৫]

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাংসদদের 'আইন প্রণয়নের' ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সংসদীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ, আইন প্রণয়ন ও সংশোধন এবং পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনের স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় প্রশাসনের ভার প্রদান করা হবে।'[২৬] প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিচালনা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, সব সরকারি সেবা বিতরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের

মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালনা (যেমন জনশৃংখলা রক্ষা), নাগরিক সেবা প্রদান ও উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায় সব কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংবিধান লঙ্ঘিত হবার কথা।

আধুনিক সরকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত- নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগ। সরকারের এ তিনটি অঙ্গ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হলেও এগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করে যাতে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' বা ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হয় এবং কোনো অঙ্গের বাড়াবাড়ির কারণে নাগরিক অধিকার খর্ব না হয়।[৭]

স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে দুর্বল না করে গতিশীল ও শক্তিশালী করার পেছনে আরো অনেক উপযোগী যুক্তি রয়েছে। স্থানীয় স্বশাসিত সরকার গঠনের উদ্দেশ্য হলো, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান।[৮] শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, পয়নিষ্কাশন, কর্মসংস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন, অধিকারহীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো মূলত স্থানীয় এবং এগুলোর সমাধান কার্যকর করতে হয় স্থানীয়ভাবেই। তাই স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করা ব্যতীত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের নেতৃত্ব কাজে লাগিয়ে যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দুরূহ সমস্যা সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা খরচেই স্থানীয়ভাবে সমাধান করতে পারেন।[৯] এ ছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যয় করা অর্থের সামান্য অংশই তৃণমূলের সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছায়।[১০] সাধারণ মানুষের কাছে সেবা ও সম্পদ পৌঁছানোর সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো কার্যকর স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের (যেমন এডিপি) হার ত্বরান্বিত করতে হলে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সম্পদ হস্তান্তর তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়।

একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অধীনে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে গতিশীল ও কার্যকর করা হলে বাংলাদেশের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়। এ জন্য অবশ্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত, সংগঠিত এবং ক্ষমতায়িত করা এবং একই সঙ্গে তাদের ন্যায্য অধিকার হিসেবে প্রাপ্য সুযোগ প্রদান করা। স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও গভীরতা অর্জন করবে এবং এর ভিত আরো মজবুত হবে। নির্বাচিত স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সংসদভিত্তিক গণতান্ত্রিক উপরিকাঠামোর খুঁটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা অপরিহার্য। যে সব সিদ্ধান্ত জনগণের জীবন সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো গ্রহণে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সব জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সুশাসনের জন্য প্রয়োজন। জনগণের দোরগোড়ার সরকার হিসেবে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের মাধ্যমেই তাদের যথার্থ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। আর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি চর্চাও কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব তৃণমূল পর্যায় থেকেই। তাই গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে এবং সুশাসন কায়েম করতে হলে একটি জন-অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দায়বদ্ধ স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নকাজে সম্পৃক্ত হওয়ার অতীত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য সুখকর নয়।[৩] গত সরকারের আমলে এ ধরনের সম্পৃক্ততার ফলে সরকার দলীয় সাংসদেরা তাদের দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে এক ধরনের 'এমপি সরকার' বা 'এমপি রাজ' গড়ে তোলেন।[৪] এ ধরনের ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকেও শুধু সাংসদদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানেই পরিণত করেনি, একই সঙ্গে বিরাজমান স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোকেও বহুলাংশে অকার্যকর করে ফেলে। বস্তুত এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সংসদ সদস্যদের এক ধরনের জমিদারি সৃষ্টি হয় এবং সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। স্থানীয় উন্নয়ন কাজে জড়িত হওয়ার ফলে সাংসদেরা যে দুর্নামের ভাগিদার হন তার মাশুল বিগত সরকারকে তাদের সম্প্রতি সমাপ্ত সংসদ নির্বাচনে দিতে হয়েছে বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত করতে হলে তৃণমূল থেকে একদল যোগ্য ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব সৃষ্টির গুরুত্বের কথা বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন। আর তা সম্ভব একটি ক্রিয়াশীল স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে। গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে সংসদ সদস্যদের গুণগত মানের পরিবর্তন সাধনও জরুরী বলে দাবি করা হয়। স্থানীয় উন্নয়ন ও স্থানীয়ভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের সুযোগের অবসান ঘটানো এ ক্ষেত্রে একটি উপযোগী ও টেকসই কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাহলে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা, যারা শুধু আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী, ভবিষ্যতে সংসদ নির্বচনে অংশগ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে 'যে কোনো মূল্যে' সাংসদ হওয়ার আকর্ষণও দূর হবে, রাজনীতি 'ব্যবসায়ে' পরিণত হবে না এবং সংসদ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে বলে আশা করা হয়।

আরেকটি বাস্তব কারণেও সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নকাজ থেকে দূরে রাখা আবশ্যক। এখতিয়ারবহির্ভূত যাবতীয় স্থানীয় উন্নয়ন কাজে জড়িত হলে সাংসদগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনিবার্য দ্বন্দ্বে জড়াতে পারেন। এমন দ্বন্দ্ব সরকার ও সরকার বিরোধীদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে না, ক্ষমতাসীন দলেও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে।

স্থানীয় সরকার কার্যক্রমে সরাসরি জড়িত না করে সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নকাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে একটি বিকল্প প্রস্তাবের কথা কেউ কেউ উপস্থাপন করেছেন: প্রতি সাংসদকে এক-দুই কোটি টাকা স্থানীয় উন্নয়নকাজে ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা। ভারতে লোকসভার প্রত্যেক সদস্যকে বছরে দুই কোটি রুপি প্রদানের 'এমপিএলএডি' (Members of Parliament Local Area Development) শীর্ষক একটি স্কিম চালু আছে। ভারতীয় এ স্কিমের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ভারতীয় লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান এরা সেজ্যুইয়ানের মতে, 'অল্প করে বলতে গেলে এ স্কিমের ব্যবস্থ.পনা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল....ধারণাগত দিক থেকেই এতে মৌলিক গলদ রয়েছে। সাধারণভাবে সাংসদদের দায়িত্ব আইন প্রণয়ন এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ.... এমপিএলএডি স্কিম সাংসদদের ভূমিকাতেই পরিবর্তন ঘটিয়েছে... তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প সম্পন্নকরণের কাজে জড়িত করেছে। এ প্রক্রিয়ায় সাংসদেরা জেনেশুনেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন এবং তারা লোকসভার সদস্য এবং সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে এ স্কিমের অধীনে তাদের নিজেদের এবং সহকর্মীদের

উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত ব্যয়ের সঠিকতা, প্রজ্ঞা ও কৃচ্ছতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার যোগ্যতা ও নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন.... স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে গত ৫০ বছরের সরকারের ব্যর্থতাকে সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে ম্লান করে দিয়েছে এমপিএলএডি স্কিমের অধীনে সৃষ্ট মাত্র গত সাত বছরের অনিয়ম.... এ স্কিম সম্পর্কে সরকারের দায়িত্ব এড়ানো এবং প্রশাসনে সাংসদদের সম্পৃক্ততা সংসদের কাছে নির্বাহী বিভাগের দায়বদ্ধতাকে খর্ব করছে এবং এভাবে রাষ্ট্রে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতাকেই দুর্বল করে তুলেছে'।[৩৩]

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় এ স্কিমের প্রবল বিরোধিতা করেন। অনেকের মতে, এ স্কিম ভারতীয় সংবিধানের ওপর একটি 'নগ্ন হামলা'। এটি ব্যবহার করা হয়েছে সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নকাজ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে 'উৎকোচ' হিসেবে। ভারতীয় সংবিধান পর্যালোচনা কমিটিও এটি বিলুপ্তির পক্ষে সুপারিশ করেছে। এ স্কিমের বিরুদ্ধে বর্তমানে ভারতে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নে জড়িত করার পক্ষে একটি যুক্তি হলো যে, তারা স্থানীয় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং জনগণ তাদের কাছ থেকে রাস্তা-ঘাট নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রত্যাশা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বস্তরে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে এ ধরনের অঙ্গীকার প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। সাংসদদের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো যদি গুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণমূলক হয়, তাহলে সেগুলো পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়িত হতে পারে। সাংসদ হিসেবে তারা সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেই এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। কেবলই সাংসদদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং ন্যায্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোনো বিশেষ এলাকার জন্য বরাদ্দ প্রদান ন্যায়পরায়ণতার নীতির পরিপন্থী। সংসদ যথাযথ নীতি নির্ধারণ করলে এবং সম্পদের জোগান দিলে সব এলাকায়ই সুষম উন্নয়ন সাধিত হবে। নীতিগতভাবে সংসদ নির্বাচনের মূল ইস্যু দলীয় নির্বাচনী ইশতেহার, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন নয়। স্থানীয় উন্নয়নে জড়িত হয়ে এবং পর্যাপ্ত উন্নয়নকর্ম সম্পন্ন করেও যে নির্বাচনে জেতা যায় না, সাম্প্রতিক জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ সে ক্ষেত্রে একটি ভালো প্রমাণ হতে পারে। মেয়াদকালে স্থানীয় উন্নয়নে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও অষ্টম সংসদের অধিকাংশ চারদলীয় জোটের সাংসদ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের যুক্ত করার পক্ষে যুক্তি হিসেবে আমেরিকার 'পোর্ক ব্যারেল' (pork-barrel) স্কিমের উদাহরণ দেয়া হয়। এ স্কিমের মাধ্যমে সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের নির্বাচনী এলাকায় আইনগতভাবে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বরাদ্দ আইন প্রণেতাদের নামে হয় না এবং তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কোনোরূপ হস্তক্ষেপও করেন না।[৩৪]

এ আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়ন কাজে ব্যাপক ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করা হবে বাংলাদেশের সংবিধানের মর্মবাণীর সাথে সাংঘর্ষিক এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (গণতন্ত্র আর আইনের শাসন সমার্থক[৩৫])ও রাজনীতিতে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার বর্তমানের সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নকর্মে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এলাকায় এলাকায় একটি দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। সাংসদদের অন্যায়

ও অনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুযোগ অব্যাহত রাখবে। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত ও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাও ব্যাহত হবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দাবি সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন।[৩৬] এর ব্যত্যয় ঘটলে বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও খাঁটি অর্থে স্বশাসিত করার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে তা-ও রুদ্ধ হবে, নব নির্বাচিত সরকারের দিন বদলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেবে বলে দাবি করা হয়।

অন্যদিকে এর বিপক্ষের দাবি বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। স্থানীয় স্বশাসিত সরকার শক্তিশালীকরণের দাবির মূল লক্ষ্য সুশাসনের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। আর এ লক্ষ্যেই স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বিদ্যমান দুর্বলতার ওপর তীক্ষ্ম নজর দেয়া হয়েছে। স্থানীয় স্বশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থায়ী হতে এবং স্থানীয় উন্নয়ন তরান্বিত হতে পারবে। ইউএনডিপি, জাপান এবং নর্ডিক দেশগুলো স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের উন্নতির জন্য পাইলট প্রকল্পে সাহায্য করেছে এবং বিশ্ব ব্যাংক এর ওপর জোড় দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের দাবি অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) তুলনায় উপজেলা পরিষদ বেশি গুরুত্ব পেতে পারে। কেননা উপজেলা ইউপি'র মত ছোট নয়, আবার জেলার মত খুব বড়োও নয়। স্থানীয় শাসন ও বিকেন্দ্রিত উন্নয়নের জন্য এটি মোক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৮০-এর দশকে উপজেলা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক কারণে বিশেষ করে সাংসদদের বিরোধিতার জন্যই যে এ পর্যায়ে গড়ে ওঠা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি ধারণাটির সঠিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর সমাধানের যে ফর্মুলা উপস্থাপিত হয়েছে, তা বাস্তবানুগ নয়। উপজেলা পরিষদ হবে সব দিক দিয়ে স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত। এর ওপর সরকারের কোনো কর্তৃত্ব, প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। স্থানীয় সাংসদরাও এদের কার্যক্রমে নাক গলাবেন না। তারা উপদেষ্টাও হতে পারবে না। কারণ সাংসদরা আইন প্রণেতা এবং সে জন্য তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্যবহার আইন প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এমন সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে দাবি করা হয়। দাবি অনুযায়ী স্থানীয় স্বশাসিত সরকার যেখানে নিজ কর্মচারীদের এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেতন-ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রেও সরকারের ওপর নির্ভরশীল সে ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিরংকুশ হতে পারে না। আর উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ যখন সরকার থেকে আসে তখন সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলেও থাকা অনিবার্য। তাছাড়া একজন সাংসদ কেবল আইন প্রণয়ন করেই তার এলাকার জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনে তার জনপ্রিয়তা বিচার করা হবে না। এলাকাবাসী সাংসদদের মূল্যায়নে দেখবে তিনি নিজ এলাকার রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার, ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিকরণ, বাঁধ নির্মাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কী ভূমিকা পালন করছেন এবং কতটুকু সাহায্য তহবিল সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসতে পেরেছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই একজন সাংসদের মূল্যায়ন এভাবেই করা হয়ে থাকে। আমেরিকার ইউরোপের

দেশগুলোতেও সাংসদদের উন্নয়ন খাতের ভূমিকা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কেবল আইন পাস করে একজন সাংসদ তার এলাকায় জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেন না। উন্নত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশেই যদি এ অবস্থা বাস্তব সত্য হয় তাহলে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের ব্যতিক্রম হতে পারবে কেমন করে দাবি করা হয়।[৩৭]

ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রশ্নে সাংসদ এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদের সমন্বয় কি সম্ভব? এ প্রশ্নের সমাধানে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদেরই এগিয়ে আসতে হবে। নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তদন্তকরণের মাধ্যমে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সুপারিশ এবং দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। সুস্পষ্ট বিধি-বিধানের মাধ্যমে উপজেলা চেয়ারম্যানদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত করতে হবে, সাংসদদের স্থানীয় পর্যায়ে ভূমিকা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিতে হবে, উভয়ের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের এ সংক্রান্ত মনোভাব গঠনে ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সর্বোপরি জন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সাংসদ এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির একটি কাঙ্ক্ষিত সমাধান নির্দেশ করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

নয়. উপজেলা আইন পাস

উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা সীমিত এবং সাংসদের নিরংকুশ ক্ষমতা দিয়ে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সংসদে বহুল আলোচিত উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) বিল-২০০৯ সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। ২০০৮ সালের ৩০ জুন থেকে আইনটি কার্যকর হয়েছে বলে আইনের ১ (২) দফায় উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় করা উপজেলা আইনের সংশোধিত আইন হিসেবে এটি পাস করা হয়। একই সঙ্গে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জারি করা স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ-২০০৮ বিলুপ্ত করা হয়।[৩৮]

নয়. ক) আইনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়

এ আইনে সাংসদদের উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়েছে এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবে, এমন বিধান করা হয়েছে। ফলে, সাংসদেরা এখন শুধু উপজেলায় উপদেশই দেবেন না, তা গ্রহণ করতে হবে এবং সাংসদকে না জানিয়ে উপজেলা পরিষদ কারোর সঙ্গে কোনো যোগাযোগও করতে পারবে না। এ জন্য সংশোধিত আইনের ২৫ ধারায় ১ ও ২ উপধারা যুক্ত করা হয়েছে। নতুন করে যুক্ত এ দফায় বলা হয়েছে, 'সরকারের সহিত কোনো বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে অবহিত রাখিতে হইবে।'

একই সঙ্গে আইনের ২৭ ধারার খ উপধারার ৪ অনুচ্ছেদে সংশোধনী এনে উপজেলা পরিষদের প্রত্যেক বৈঠকের পর পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে কার্যবিবরণী স্থানীয় সাংসদের কাছে পাঠাতে হবে। আগে এ কার্যবিবরণী শুধু সরকারের কাছে পাঠানোর বিধান ছিল।

সংশোধিত আইন অনুসারে উপজেলা পরিষদে ১৪টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে। উপজেলা চেয়ারম্যান এসব কমিটির প্রধান হতে পারবেন না। কমিটিগুলো হলো আইনশৃঙ্খলা,

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, ভূমি, মৎস্য ও পশসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, তথ্য ও সংস্কৃতি, বন ও পরিবেশ এবং বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ। পরিষদের সদস্য বা স্থানীয় অন্য কোনো ব্যক্তি এসব কমিটির সভাপতি হতে পারবেন।

নয়. খ) পরিপত্র জারি

ভাইস চেয়ারম্যানের কাজ কি হবে, সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা ছাড়াই উপজেলা পরিষদের কাজ পরিচালনা অন্তর্বর্তী নীতিমালা জারি করা হয়েছে। ৫ মে ২০০৯ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করে। সে অনুসারে ৭ মে উপজেলা পরিষদের আনুষ্ঠানিক কাজ পরিচালনা শুরু হয়েছে।[২৯] পরিপত্রে পরিষদের সভা আহ্বান থেকে শুরু করে উপজেলা চেয়ারম্যানদের স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তবে মূল আইনে স্থানীয় সাংসদদের পরিষদের উপদেষ্টা রেখে সব ধরনের কাজে তাদের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে পরিষদ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে কি-না, সে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

নয়. গ) সম্ভাব্য নতুন সংকট

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি অনুমোদন না করে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৯৮ সালে প্রণীত উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধিত আকারে অনুমোদন করে। এ আইনের কতগুলো গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল থেকে দাবি করা হয়। এ আইনের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং পরিষদকে উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৪২ ধারায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিধান করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদের পক্ষ থেকে সাংসদকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪০] এ সকল বিধানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ওপর স্থানীয় সংসদ সদস্যদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে সর্বক্ষেত্রে সাংসদের পরামর্শ নেয়া বাধ্যতামূলক করে আইন পাস করায় এবং এর পরে সাংসদদের হাতে ক্ষমতা আরো কেন্দ্রীভূত করে কার্য পরিচলানার নীতিমালাসহ পরিপত্র জারি করা হওয়ায় অনেকে এটাকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪১] পরিপত্র জারির পর উপজেলা চেয়ারম্যানদের ধারণা হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে তাদেরকে সাঁতার কাটতে বলা হয়েছে। কারণ পরিপত্রে মোটা দাগে প্রায় সব ক্ষমতা চূড়ান্ত অর্থে রেখে দেয়া হয়েছে সাংসদদের হাতে।[৪২] উপজেলা পরিষদ আইনটি চরমভাবে বৈষম্যমূলক। কারণ এতে একক আঞ্চলিক এলাকা থেকে নির্বাচিত ৩০০ জন সাংসদকেই উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়েছে। সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত বাকি ৪৫ জন নারী সদস্যের এ ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখা হয়নি। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সংরক্ষিত সাংসদদের পক্ষ থেকে হতাশা ব্যক্ত করে তাদের কর্তৃত্বের ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করেছেন।[৪৩] সাংসদগণ জাতীয় সংসদের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত, তাদের দিয়ে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে

নিঃসন্দেহে স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মূল চেতনা নষ্ট হবে। আইনের ২৬(২) ধারা অনুযায়ী পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হবে। প্রধান নির্বাহী হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হলেও সংশোধিত আইনের মাধ্যমে তাকে পরিষদের প্রধান নির্বাহী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধান নির্বাহী পদ নিয়ে এমন অশুভ খেলাকে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বিকাশে অপতৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আইনের ৫০ ও ৫১ ধারায় পরিষদের ওপর সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেতনার পরিপন্থী।

আইনগত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে অনেক উপজেলার কর্তৃত্ব স্থানীয় সাংসদগণ নিয়েছেন। বিরোধী দলের উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে এ কর্তৃত্ব অযৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মিডিয়ায় প্রচার রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংসদের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় নেতারাও উপজেলার ওপর কর্তৃত্ব করবেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৪] উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণও অনেক ক্ষেত্রে, সম্ভাবত বাধ্য হয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পরিবর্তে সাংসদদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করছেন এবং ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের এমন ভারসাম্যহীনতার কারণে ভবিষ্যতে উপজেলা পরিষদে তাদের ত্রিশংকু অবস্থার আশংকা করছেন। এমন অবস্থায় তাদের অনেকেই উপজেলা প্রশাসন থেকে সরে আসার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে দৌড় ঝাঁপ শুরু করেছেন বলে খবর বেরিয়েছে।[৪৫] এ অবস্থা উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাকেই অকার্যকর করে তুলতে পারে। আবার ভাইস চেয়ারম্যানদের দায়িত্বের কোনো উল্লেখ পরিপত্রে নেই- যা একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জটিলতার আরেকটি উৎস হলো যে, অনেক উপজেলায় একাধিক সাংসদ রয়েছেন। এখন সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কোনো সাংসদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তার ব্যাখ্যাও অনুপস্থিত। তাই দাবি করা যায়, এই আইনের মাধ্যমে একটি অহেতুক দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, যার বিস্ফোরণ অবসম্ভাবী। অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো বটে, কিন্তু এই যাত্রা আসলে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরটিকে আদৌ কার্যকর ও ফলপ্রসূ করবে কি-না সেটা নিয়ে ঘোর সন্দেহ আলোচিত হচ্ছে।

দশ. উপজেলা পরিষদে সাংসদদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্বরূপ

উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সাংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে চলমান বিতর্কে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ, সাংসদ, উপজেলা চেয়ারম্যান, মিডিয়া এবং স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক মাত্রায় মতামত পাওয়া গিয়েছে। সংগৃহীত মতামতের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতেই এ সংক্রান্ত বির্তকের একটি সম্ভাব্য উপযোগী উপসংহার টানার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। জাতীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সাংসদগণ রাষ্ট্রের আইন ও নীতি প্রণেতা। পক্ষান্তরে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিনিধিগণ মূলত উন্নয়ন

কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নকারী এবং কিছু কিছু নাগরিক সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী। সুতরাং স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনীতিকরণ করা হলে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নাগরিক সেবাসমূহ এবং উন্নয়নের সুফল থেকে রাজনৈতিক মতবিরোধীদের বঞ্চিত করতে উদ্যত হতে পারেন বলে দাবি করা হয়।[৪৬] আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক/ মহাসচিবকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান স্থানীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকরণের প্রয়াসের প্রকাশ মাত্র।[৪৭] বর্তমান সরকারের আমলেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। আর এতে একটি স্বাধীন ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিক স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার বিকাশ তাতে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হবার আশংকার দাবি গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। উপজেলা পরিষদের ওপর জাতীয় সাংসদদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে নীতি ও আইনগত। একজন সাংসদকে সংবিধান আইন পরিষদে ভূমিকা পালনের অধিকার দিয়েছে। তিনি একটি নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন তা সংবিধানের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি বহির্ভূত কাজ।[৪৮]

এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান বলেন, 'বর্তমান উপজেলা পরিষদ আইন স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের জন্য বড়ো একটা বিপর্যয়। এ আইনে উপজেলাকে দারুণভাবে সাংসদ নির্ভর করা হয়েছে।'[৪৯] তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, 'এ আইনের মাধ্যমে উপজেলা চেয়ারম্যানদের দুই পায়ে দু'টি বেড়ি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এর একটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও আরেকটি সাংসদদের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।'[৫০] সদ্য বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'স্থানীয় যেকোনো শাসন ব্যবস্থাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিলে তাকে কার্যকর করা যায় না।' সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'এ ধরনের দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কখনো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারবে না।'[৫১] বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) এক বিবৃতিতে এ ধরনের আইনকে প্রত্যাখ্যান করে একে অসাংবিধানিক ও গণতন্ত্রের মূল চেতনার পরিপন্থী বলে দাবি করেছে। বহুল প্রত্যাশিত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নের যে গণ আকাঙ্ক্ষা তা উপজেলা পরিষদ বিল পাসের মধ্যদিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করা হলো বলে দাবি করেছেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতারা।[৫২] সাংসদদের ক্ষমতা নিশ্চিত করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের ধারণাই বদলে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন রাশেদ খান মেনন। তিনি আরো বলেন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তিত এ সংক্রান্ত আইনটি ছিল রাজনীতি বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা। আর এখন চলছে উপজেলাকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার বিরোধী চেষ্টা।'[৫৩] আবার হেদায়েতুল ইসলাম বলেন, 'সাংসদদের কাজ শুধু আইন প্রণয়ন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এলাকার মানুষের সমস্যা, প্রয়োজনও তিনি দেখবেন।' স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধ গতিশীল ও শক্তিশালী করতে হবে। সাংসদ ও চেয়ারম্যানদের যার যার কাজের ক্ষেত্র ও ভূমিকা আলাদা না থাকলে সংঘাত অনিবার্য। প্রয়োজনে আচরণ বিধি তৈরি করা যেতে পারে বলে মনে করেন ইনাম আহমেদ চৌধুরী।[৫৪] উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রশ্নে সকল দলের সাংসদদের মধ্যে নজিরবিহীন ঐকমত্য নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। দু'টি বড় রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় ও ব্যক্তিগত

স্বার্থে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার চেষ্টা করছে। শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি প্রশ্নে বড় দু'দলের এমপিরা যেমন একমত হন তেমনি উপজেলায় সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব প্রশ্নেও তারা একমত।[৫৫] সাংসদদের যদি নিজেদের ক্ষমতা না বাড়িয়ে জনগণের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করতেন তাহলে আমাদের গণতন্ত্রের জন্য ভালো হতো বলে মনে করেন ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ।[৫৬] উপজেলা পরিষদ নেতৃবৃন্দসহ প্রাজ্ঞজনের পাশাপাশি নাগরিক সমাজেও নির্বাচিত উপজেলা পরিষদে সাংসদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিস্তৃত পরিধি নিয়ে ব্যাপক মাত্রায় সমালোচনা রয়েছে।[৫৭] ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সুজন'র সংবাদ সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'গণতন্ত্র ধরে রাখতে হলে উপযুক্ত নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় স্বশাসিত সরকার দুর্বল হলে এটা কখনো সম্ভব নয়। আইনের শাসন আইনের মাধ্যমে সাংসদের স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব দেয়া হলে এটা কেবল সংবিধান বিরোধী হবে না, একই সাথে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার পরিপন্থী হবে।' সাবেক উপদেষ্টা এম. হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, 'এ আইনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হবে।' বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'এটা গণতান্ত্রিক চর্চার সাথে অসংগতিপূর্ণ। এ ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব থাকবে কিন্তু দায়বদ্ধতা থাকবে না।'

দশ. ক) ৬ মে ২০০৯ সুজন'র উদ্যোগে এক গোলটেবিল বৈঠকে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করা হয়:

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'উপজেলা ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে এ সরকার আইন করেছে এমনটা ভাবা ঠিক নয়।' গোলটেবিলের মূল প্রবন্ধে সুজন সম্পাদক বলেন, 'আইনটিকে বিকৃত, বৈষম্যমূলক ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ উল্লেখ করেন। বর্তমান আইনটি বলবৎ থাকলে উপজেলা ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে বলে' দাবি করেন।' সাংবাদিক ও কলামিষ্ট আব্দুল কাইয়ুম বর্তমান আইনের মাধ্যমে সাংসদকে দিয়ে এক ব্যক্তিনির্ভর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে দাবি করেন। জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতা শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, 'সংবিধানে আমাদের যে কাজের কথা আছে কেবল তা পালন করে কেউ দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে পারবেন না, তাই জনপ্রতিনিধিদের কাজের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে।' বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় নেতা রুহিন হোসেন বলেন, 'এরশাদ সরকার উপজেলা ব্যবস্থার নামে উপজ্বালা ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন আর এখন সংসদে অনেক দল মিলে অতিজ্বালা ব্যবস্থা তৈরি করেছে।'[৫৮] মূলত, রাউন্ড টেবিলের বক্তারা উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পরিষদ আইনকে সংশোধনের ওপর জোর দেন যাতে কাজে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের কার্যক্রমের গতিশীলতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এস এম শাহজাহান বলেন, 'শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে হবে, যার স্বীকৃতি সংবিধান দিয়েছে। স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন আর এ জন্য সাংসদ এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে হবে। যাতে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।[৫৯]

২১ মে ২০০৯ অনুষ্ঠিত নীতি গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনারে মূল প্রবন্ধ আলোচনায় ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান উল্লেখ করেন, সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা মূলত ক্ষমতার বণ্টন, পারস্পারিক অসহযোগিতা, বরাদ্দ কম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। এখান থেকে উত্তরণের জন্য দরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বাজেট থেকে থোক বরাদ্দ বন্ধ, পারস্পারিক সহযোগিতা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা। সাবেক মন্ত্রী মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে নয়, বরং রাজনীতিকে যুক্ত করে এবং মানসিকতাকে পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা সম্ভব। সাবেক স্থানীয় সরকার সচিব সরফরাজ হোসেন উপজেলায় কোয়সি জুডিশিয়াল ব্যবস্থা, সোশ্যাল অডিট, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জোরদার ও বরাদ্দ বাড়ানোর ওপর জোর দেন। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্র শক্তিশালী করা, গণতদারকি কমিটি গঠন, গণতন্ত্রের সামগ্রিক চর্চা ও মানসিকতার পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় সরকার তখনই শক্তিশালী হবে, যখন স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হবে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে। স্থানীয় সরকারই গণতন্ত্রের ভিত্তি। এটা কার্যকর না হলে গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না। গণতন্ত্রের অতীত ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল এমন দেশগুলোতে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকারের উদ্ভব হয়। মিডিয়া রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠক এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বিদগ্ধজনের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের ওপর সাংসদদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা হয়, আবার ক্ষেত্র বিশেষে সাংসদ-চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। যদিও এই ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চার পদ্ধতি কি হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সুপারিশ পাওয়া যায়নি। তবে উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সাংসদদের একক কর্তৃত্বের বিরোধিতার ব্যাপারে প্রাজ্ঞজনের ঐকমত্য সরকারের এ সংশ্লিষ্ট আইন পাসে শক্তিশালী স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার গণ আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু বলে দাবি করার যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

দশ. খ) উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রতিক্রিয়া

উপজেলা পরিষদে সব ক্ষমতা সাংসদদের হাতে দেয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় উপজেলা চেয়ারম্যানরা সংবিধানে স্থানীয় সরকারের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই আইন তার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন।[৬০] উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা কমাতে আর শুল্কমুক্ত গাড়ি পেতে জাতীয় সংসদে সব সাংসদ যেভাবে একমত হয়েছেন তা নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান এম তৈয়বুর রহমান। মূলত, সাংসদদের উপদেষ্টা নয়, আমাদের বস করা হয়েছে। আমরা যে আর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবো না তা বলার অপেক্ষা রাখে না বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার জামায়াত সমর্থিত চেয়ারম্যান কেরামত আলী। এমন নির্দেশনা থাকায় এখন চেয়ারম্যানদের স্বকীয়তা বলে কিছু রইলো না বলে কিশোরগঞ্জের কুলিয়াচর উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম মন্তব্য করেন। সংবিধান অনুযায়ী এ আইন করা হয়নি। সাংসদদের খুশি করা হয়েছে বলে দাবি করেন কেশবপুর থেকে নির্বাচিত

সাত. উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্কের পটভূমি

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে গঠিত ও পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের আইন পরিষদের তৈরি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হয় এ প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন এবং বিধিমালা তৈরীর মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের গঠন, আর্থিক সংস্থান ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর, ফি ও টোল আরোপ এবং আদায় করতে পারে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এক অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উপযোগী ব্যবস্থাপনা।[৮] এ ছাড়া স্থানীয় আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে এটি একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত এবং নন্দিত। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি স্থানীয় স্বশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের ইতিহাস মোটেও প্রাচীন নয়। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের পর উপজেলা পর্যায়ে 'থানা কাউন্সিল' গঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ৭ নং আদেশ দ্বারা উক্ত থানা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের গুণগত পরিবর্তন করে থানাকে উপজেলা হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিষদ করা হয়। এতে করে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্বশাসনের শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের আলোকে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট রহমতুল্যা কমিটির সুপারিশের আলোকে পুনরায় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে উপজেলা নামকরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ আইন প্রবর্তিত হয়।[৯] পরবর্তীতে বাংলাদেশের সদ্য বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারিকৃত (২০০৮ সালের ১২ মে)[১০] অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে তিন স্তর বিশিষ্ট নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। স্তরগুলো হলো ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা। 'সাবসিডিয়ারিটি তত্ত্বের' আলোকে ওপরের স্তরগুলোর দায়িত্ব হবে সীমিত। এ তত্ত্বের মূল কথা হলো, সর্বাধিক নিম্নস্তরের সরকারের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক এবং যে সব সমস্যা নিম্নের স্তরে সমাধান সম্ভব নয়, কেবল সেগুলোর দায়িত্বই ক্রমাগতভাবে ওপরের স্তরে অর্পিত হবে। এখনও জেলা পরিষদ কার্যকর হয়নি। সুতরাং বিদ্যমান দুই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যে বর্তমানে উপজেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের (ইউপি) মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে উপজেলা পরিষদের কার্যকারিতা প্রশ্নে ঘনিভূত সন্দেহের কথা আলোচিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইনে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকার উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করার বিধান ছিল। পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৮ (৩২ নং অধ্যাদেশ) -এ উপজেলা পরিষদ

চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা এইচ. এম. আমীর হোসেন। কিন্তু যেভাবে আমাদের ক্ষমতা খর্ব করা হলো তাতে জনগণকে আমরা কি জবাব দেব বলে হতাশা ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ময়জদ্দিন। এ ধরনের আইন করে স্থানীয় সরকারকে ধ্বংস করা হলো বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার।[৩১] উপজেলা পরিষদে সাংসদদের চাপিয়ে দিয়ে প্রকারন্তরে উপজেলাকে প্রতিবন্ধী করা হচ্ছে বলে উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন মনে করে।[৩২] আমরা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সমন্বয় চাই বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বয়কারী বদিউজ্জামান বাদশা।[৩৩] যেভাবে আইনটি পাশ হলো তাতে সমন্বয় নয়, উপজেলায় সাংসদদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ হাওলাদার হতাশা ব্যক্ত করেন। উপজেলা চেয়ারম্যানরা সংঘাত চান না, সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের কাজ করতে চান।[৩৪] বর্তমান আইনের অধীনে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারকে শক্তিশালী করতে উপজেলা পরিষদের কোনো ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। আইন করে উপজেলা ব্যবস্থাকে কবর দেয়া হয়েছে। এখানে উপজেলা চেয়ারম্যানদের কিছু করার নেই বলে এক গোল টেবিল আলোচনায় কয়েকজন চেয়ারম্যান অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩৫]

সাংসদদের হাতে সব ক্ষমতা চলে গেলে এলাকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপজেলা চেয়ারম্যানদের সাথে সাংসদদের গণ্ডগোল লেগে থাকবে বলে আশংকা ব্যক্ত করেছেন কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার চেয়ারম্যান ও বিএনপি'র নেতা আবু বকর সিদ্দিক। সাংসদদের পরামর্শ ছাড়া নিজ মন্ত্রণালয়েও সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে না এমন আইন পাশ হওয়ার পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনো স্বাধীন হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রামু উপজেলা চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা সোহেল সারওয়ার। উপজেলা আইনকে শিকল পরানোর সাথে তুলনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণকে ভুল সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেছেন কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার চেয়ারম্যান জহিরুল হক। জাতীয় স্বার্থে কখনোই ঐক্যবদ্ধ মতামত দিতে দেখা যায়নি সাংসদদের। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সব দলের সাংসদদের একমত হতে দেখে হতাশা ব্যক্ত করেছেন চাঁপাই নবাবগঞ্জের গোমাস্তাপুর উপজেলার বিএনপি সমর্থিত চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম। এ আইন পাশের মাধ্যমে চেয়ারম্যানদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে সংসদ, হতাশা ব্যক্ত করেছেন বরিশালের হিজলা উপজেলার আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান সুলাতন মাহমুদ। সাংসদদের মতো চেয়ারম্যানদেরও এলাকার মানুষ ভোট দিয়েছে এলাকার উন্নয়নের জন্য। তাই আমাদের ক্ষমতাহীন করা অন্যায় হয়েছে। আমরা এখন সাংসদদের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হব বলে হুঁশিয়ারী প্রদান করেন বরিশাল সদর উপজেলার চেয়ারম্যান বিএনপি সমর্থিত আজিজুল হক। সংবিধান লঙ্ঘন করে উপজেলা আইন পাসের ঘটনা দেশের মানুষকে হতাশ করেছে। উপজেলা চেয়ারম্যানদের ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করা হয়েছে বলে দাবি করেন দিনাজপুর উপজেলা চেয়ারম্যান মোফাজ্জেল হোসেন। তাই এই কালো আইন প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার এবং প্রয়োজনে আদালতে যাওয়ার হুমকী দিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগর উপজেলা চেয়ারম্যান আহসানুল হক।[৩৬] এতে উপজেলায় একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সংঘাত করে জনগণের সেবা করা সম্ভব হবে না বলে আশংকা ব্যক্ত করেন উপজেলা ফোরাম আহ্বায়ক সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা চেয়ারম্যান

মহিবুর রহমান।[৬৭] দলমত নির্বিশেষে উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে বলা যায়, উপজেলা আইনের প্রতি উপজেলা পরিষদ নেতৃত্বের আস্থার গুরুতর সংকট রয়েছে। সংকটটির ঘনিভূত রূপ বাস্পায়িত হয়ে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এ স্তরটির সাবলীল বিকাশে নিশ্চিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা যায়।

দশ. গ) আমলাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া

বিদ্যমান আইনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) পরিষদের সচিব হিসেবে উল্লেখ করায় এবং কোনো কর্তৃত্ব না দেয়ায় আমলাতন্ত্রের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী নাম প্রকাশে অনেক সরকারি কর্মকর্তা এটাকে তাদের জন্য অপমানজনক বলে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, সাংসদদের খবরদারিতে উপজেলা চেয়ারম্যানরা যেমন কাজ করতে পারবেন না, তেমনি হতাশাগ্রস্ত ইউএনওরাও কাজে উৎসাহ পাবেন না।[৬৮]

দশ. ঘ) ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ এবং সাংসদদের প্রতিক্রিয়া

উপজেলা পরিষদ আইন সংক্রান্ত বিলটি পাশের প্রস্তাব উত্থাপনকালে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সংসদে বলেন, 'আওয়ামী লীগ শক্তিশালী স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বিপক্ষে নয়। ২০০৮ সালের জারিকৃত উপজেলা অধ্যাদেশটির সাথে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা না থাকায় তা বাতিল করা হয়েছে বলে দাবি করেন।'৬৯ অবশ্য এর পূর্বে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রধান আলেকজান্ডার গ্রাফ ল্যাম্বসডর্ফ এর সাথে সাক্ষাতকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকার সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ও সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বলে দাবি করেন।[৭০] মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী অধিকাংশ সাংসদ উপজেলায় তাদের ক্ষমতা দেয়ায় খুশি হলেও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীসহ আরো অনেকেই এর বিরুদ্ধে ছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ সাংসদদের চাপে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে।[৭১] ৬ এপ্রিল ২০০৯ আইনটি পাশের আগে কয়েকটি সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়েও সেদিন বাকি সাংসদদের তোপের মুখে পড়েন সরকার দলীয় সাংসদ আ ক ম মোজাম্মেল হক। সংশোধনীতে তিনি উপজেলায় সাংসদদের উপদেষ্টা রাখার বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু বাকি সাংসদদের বিরোধিতার কারণে সংশোধনী প্রস্তাব আর উত্থাপনই করতে পারেননি তিনি।[৭২] এর পূর্বে ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, স্থানীয় সরকারে সাংসদদের ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক আছে। সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম সাংসদদের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত থাকার চেয়ে আইন প্রণয়নেই বেশি দেখতে চায়। এ সময় সাংসদেরা সমস্বরে নো' নো' ধ্বনি দিয়ে সংসদ উত্তপ্ত করে তোলেন। সাংসদেরা কিছুটা শান্ত হলে তিনি বলেন, স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কাজ অবশ্যই সাংসদদের ভূমিকা থাকবে। তারা সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অনেক দেশেই সাংসদেরা নিজের নির্বাচনী এলাকায় নানা উন্নয়ন কাজ এমনকি শিল্প কলকারাখানা স্থাপন ও স্কুলে ভর্তির ব্যাপারেও চিঠি লিখেন।[৭৩] উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) ২০০৯ বিল সংক্রান্ত সংসদীয়

কমিটির চেয়ারম্যান রহমত আলী এমপি বলেন, 'উপজেলা পরিষদে সাংসদদের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজের আহ্বান জানিয়ে বলেন এতে স্থানীয় উন্নয়ন দ্রুত হবে।'[১৪] সুজন'র গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের সাংসদ সানজিদা খাতুন বলেন, 'উপজেলা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পরিষদকে কাজ করতে হবে।' এছাড়া বিএনপি'র সাংসদ নজরুল ইসলাম মনজু বলেন, 'শক্তিশালী উপজেলা পরিষদ গঠনের জন্য জেলা পরিষদ গঠন করা উচিত।'[১৫] তবে উপজেলা আইনের বিরোধিতায় চেয়ারম্যানদের আন্দোলনের হুমকীর পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, সরকারকে বেকাদায় ফেলার চিন্তা থেকেই চেয়ারম্যানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলা হচ্ছে, যা কাম্য নয়। তবে কোনো আন্দোলনের হুমকীতেই সরকার ভীত নয় বলে কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী দাবি করেন।[১৬]

উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদের কার্যকারিতা প্রশ্নে শূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র সাংসদ বনাম উপজেলার চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয় প্রসঙ্গে সমস্যা উত্থাপন হলেও সংরক্ষিত নারী সাংসদদের ভূমিকার সুনির্দিষ্টকরণে এ আইন যেমন ব্যর্থ, তেমনি ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ের দায়িত্বের পরিধি নির্ণয়ে অকার্যকর প্রতীয়মান হয়েছে। নানামাত্রিক সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত উপজেলা পরিষদের ভাগ্য নির্ধারণে এ সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধনের পাশাপাশি ক্ষমতাসীনদের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার (যা নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যক্ত করা হয়েছে) বাস্তবায়ন প্রয়োজন। শক্তিশাালী স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বিকাশে গণতন্ত্রের ভিত্তি যে গভীর হয় সে চেতনার তাৎপর্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশের জন্য উপজেলা ব্যবস্থাকে কার্যকর অর্থে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প অবশিষ্ট নাই। আর এর জন্য পক্ষদ্বয়ের বিপরীত মতামত পরিহারপূর্বক সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সহযোগিতার ঐক্যের ডাক আজ জন আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। কেবলমাত্র ব্যক্তি সাংসদদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিধিকে বিস্তৃত, বল্গাহীন এবং উন্নয়ন বরাদ্দের অধিকাংশই দুর্বিনীত দুর্নীতিতে গ্রাস করার হীন মনোবৃত্তি ত্যাগ করার মানসিকতা এবং সেই সাথে উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক সাংসদকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করে উন্নয়ন তৎপরতা গ্রহণ করলে উভয়ের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অসহনীয় প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি দূর হবে এবং স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে এবং জাতীয় উন্নয়ন গতি পাবে। সর্বোপরি গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী হবে এবং জন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

এগার. সমন্বয়ের প্রস্তাব

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট এলাকার পক্ষে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিকে পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত সার্বিক বিবেচনায় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক বলে কেউ কেউ দাবি করেন।[১৭] কিন্তু এ পরিষদের জন্য উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করলে কিছু যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা হতেই পারে। যেমন উপজেলা প্রশাসন কার জনগণের? উপজেলা চেয়ারম্যানের? উপজেলা নির্বাহী অফিসারের? নাকি সাংসদের? কার নিয়ন্ত্রণ কতটুকু বিস্তৃত। ত্রিমুখী, চতুর্মুখী টানাপোড়েনে পুরো উপজেলা ব্যবস্থাটাই আজ টলায়মান। তাই বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল অর্থাৎ কার্যকারী ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি মেনে চলতে হবে। এই ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি নির্ধারণের

দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।[৮] উপজেলা পরিষদকে উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় উপদেশ গ্রহণ না করলে কি হবে তা সহজে অনুমেয়। এই অবস্থায় উপজেলা পরিষদ ও উপজেলার মাঠ প্রশাসন কোথায় দাঁড়াবে, তা কোন ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হবে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা না গেলেও ধারণা করা যায় যে, দ্বৈততা ও ত্রৈততার আবর্তে প্রাতিষ্ঠানিকতা বিনষ্ট বা বাধাগ্রস্ত হবে।[৯] এ প্রসঙ্গে মো: মকসুদুর রহমান লিখেন: 'দু'জনই স্থানীয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং স্থানীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যের ভূমিকা থাকা দরকার। এমনভাবে আইন প্রণয়ন করতে হবে যেন তাদের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা না দেয়। .... আমার অভিমত অনুসারে উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যের ভূমিকা থাকতে পারে তবে, তা পরিষদের স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে নয়। গণতন্ত্রের চূড়ায় অবস্থান করে নিচের স্তরের ক্ষতি সাধন করা যাবে না। তাহলে দুর্বল ভিত্তিপ্রস্তর দ্বারা নির্মিত প্রাসাদের মত গণতন্ত্রও ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। ভিত্তিপ্রস্তর দুর্বল রেখে যেমন কোনো প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না, তেমনিভাবে স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রকে লালন-পালন না করে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের বিকাশও সম্ভব নয়।[১০] স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কেবলমাত্র স্থানীয় এলাকায় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না, কেন্দ্রীয় প্রশাসনকেও সঠিক পরিচালনার গতিপথের সন্ধান দিতে পারে। ইহা স্থানীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থ-জড়িত কাজের সমাধানে কেন্দ্রের চাপ বহুল পরিমাণ লাঘব করতে সক্ষম।[১১] সাম্প্রতিক সময়ে পুনঃপ্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থার বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারলে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন এবং জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক পরিবেশ প্রকৃত অর্থে জন প্রতিনিধিত্বশীল একটি ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালিত হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শীতার ফলেই তা সম্ভব হয়ে ওঠতে পারে বলে ধারণা করা যায়। উপজেলা চেয়ারম্যান এবং সাংসদদের সমন্বয়ের প্রশ্নে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো:

১. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাংসদদের মধ্যে আইনগতভাবে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের এখতিয়ারের সীমা নির্ধারণ।

২. চেয়ারম্যান এবং সাংসদ উভয়ের নামে কেন্দ্রীয় থোক বরাদ্দ বিতরণ এবং তার ব্যয়ের সঠিক হিসাব নিরীক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

৩. থোক বরাদ্দসহ উপজেলা পরিষদের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে উপস্থাপনের নীতি নির্ধারণ এবং পর্যায়ক্রমে উপজেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়নের নীতি নির্ধারণ।

৪. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতপূর্বক সমাধানের ধারাবাহিকতা নিরূপণ।

৫. সাংসদ এবং পরিষদ নেতৃবৃন্দের অফিস ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন নৈতিকতার (Development Ethics) প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬. স্থানীয় পরিষদের আয়ের উৎস বৃদ্ধিকরণ, কেন্দ্র-নির্ভরতা হ্রাসকরণ এবং পর্যায়ক্রমে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের প্রক্রিয়া গ্রহণ।

৭. স্থানীয় সরকার অর্থ মঞ্জুরী কমিশন গঠন। এ কমিশন স্থানীয় সরকার শাসনের আর্থিক অনুদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ ও তদারক করতে পারবে।

৮. উভয়ের কার্যকলাপের পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের রিভিউ কমিটি গঠন।

৯. জেলা পরিষদ গঠনপূর্বক সাংসদের তাতে সম্পৃক্ত করার কৌশল নির্ধারণ এবং

১০. সাংসদ ও চেয়ারম্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সহায়ক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় করণীয় প্রসঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত পরামর্শক পরিষদ গঠন।

বার. উপসংহার

শক্তিশালী স্থানীয় স্বশাসিত সরকার এবং গণতন্ত্র একটি আরেকটির পরিপূরক। কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রমই নয়, বরং উল্টোটাই দেখা যায়। অগণতান্ত্রিক সরকারের আমলে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার যতোটা গুরুত্ব পায়, গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে তা ততোটাই দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। সার্বিক বিবেচনায় এ প্রবণতা অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য এবং গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশের পরিপন্থী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুর্বল স্থানীয় স্বশাসিত সরকারকে শক্তিশালীকরণে যে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হয়েছে তা অবশ্যই আশার কথা। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের আন্তরিকতাও প্রশ্নাতীত। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালের অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার তার দালিলিক প্রমাণ দেয়। কিন্তু ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অধিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জারিকৃত স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা অধ্যাদেশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন (সাংসদদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত) আনয়নে নজিরবিহীন ঐক্য ব্যাপকমাত্রায় সমালোচিত এবং প্রতিষ্ঠানটির শক্তিশালীকরণের পথে বড় বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে গণমাধ্যম, বিশেষজ্ঞমহল, উপজেলা পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজ এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং সাংসদদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের পথ কি, সে ব্যাপারে উপযুক্ত সুপারিশ উপস্থাপিত হয়নি। তাই বর্তমান সময়ে আলোচিত এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক দলসমূহ, নাগরিক সমাজ, বিশেষজ্ঞমহল এবং গণমাধ্যম সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্মাণে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের বিকাশে আন্তরিক ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা হয়। এতে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হবে—সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

তথ্য নির্দেশ

১ প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।
২ H. Lasswers & A. Kaplan, Power and Society, New Heaver: Yele University Press, 1950, pp. 84-98.
৩ De Jouvenal, Betran', Sovereignty: An Inquiry into the political Good, University of Chicago press,1995,p.24.
৪ উদ্দীন, মোঃ আনসার, লোকপ্রশান তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ঢাকা: অধুনা প্রকাশনা,২০০৮,পৃ.১২৬।
৫ বিস্তারিত পাঠের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়, ১৯৯৮।
৬ মজুমদার, বদিউল আলম, আত্মঘাতি উদ্যোগ থেকে বিরত থাকতে হবে, প্রথম আলো, ২৪ জানু. ০৯।
৭ মজুমদার, বদিউল আলম, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্তমান হালচাল, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মে ২০০৯।
৮ মন্ডল, গৌতম, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ঐতিহাসীক বিবর্তন, সমকাল, ২২ জানুয়ারী ২০০৯।
৯ জাহাংগীর, একেএম, মাঠ প্রশাসন, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ. ১২১-১২৩।
১০ প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।
১১ আহমেদ, তোফায়েল, চেয়ারম্যান নয়, উপজেলা পরিচালনা করবে পুরো পরিষদ, প্রথম আলো, ১৮ জানুয়ারী ২০০৯।
১২ প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারী ২০০৯।
১৩ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।
১৪ প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারী ২০০৯।
১৫ প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারী ২০০৯।
১৬ প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারী ২০০৯।
১৭ প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারী ২০০৯।
১৮ প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারী ২০০৯।
১৯ জাহাংগীর, প্রাগুক্ত, ২০০৬,পৃ.২২।
২০ প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৯।
২১ প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারী ২০০৯।
২২ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারী ২০০৭।
২৩ প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারী ২০০৯।
২৪ প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯।
২৫ প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯।
২৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮।

২৭ মজুমদার, বদিউল আলম, প্রাগুক্ত, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯।

২৮ মজুমদার, বদিউল আলম, জনগণের ক্ষমতায়ন হলেই রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে, প্রথম আলো, ০৩ মে ২০০৯।

২৯ সিদ্দিকী কামাল ও অন্যান্য, উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, ঢাকা:এনআইএলজি, ১৯৮৬, পৃ.২৬-৩০।

৩০ রহমান, আতিউর, বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম, ঢাকা: প্রজাপতি প্রকাশনী, ১৯৯১।

৩১ মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, জেলায় জেলায় সরকার: স্থানীয় সরকার আইনসমূহের একটি পর্যালোচনা, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০২,পৃ. ৯৯।

৩২ মজুমদার, বদিউল আলম, প্রাগুক্ত, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯।

৩৩ ঋৎড়হঃ ষরহব, ১৫ঃয গধৎপয ২০০২.

৩৪ মজুমদার, বদিউল আলম, প্রাগুক্ত, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯।

৩৫ মকসুদ, সৈয়দ আবুল, গণতন্ত্র তঁহু মম শ্যাম সকল, প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০৯।

৩৬ যুগান্তর, ২৫ মার্চ ২০০৯।

৩৭ হাই, হাসনাত আবদুল, সুশীল সমাজ এবং উপজেলা, যুগান্তর, ১০ মার্চ ২০০৯।

৩৮ সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৯।

৩৯ প্রথম আলো, ৭ মে ২০০৯।

৪০ সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন'র ৬ মে২০০৯ তারিখের গোল টেবিলে সুজন সম্পাদক ড.বদিউল আলম মজুমদার।

৪১ সম্পাদকীয়, প্রথম আলো, ৭ মে ২০০৯।

৪২ প্রথম আলো, ৭ মে ২০০৯।

৪৩ যুগান্তর, ৮ মে ২০০৯।

৪৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ মে ২০০৯।

৪৫ প্রথম আলো, ৭ মে ২০০৯।

৪৬ Siddiqui, Kamal, Local Governance in Bangladesh: Leading Issues and Major Challenges, Dhaka: UPL, 2000, P. 64.

৪৭ পাশা, আনোয়ার, ঘূর্ণাবর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কতিপয় সাম্প্রতিক বিতর্ক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, দ্বাবিংশততম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মার্চ ২০০২, পৃ: ৩৯।

৪৮ আহমেদ, ড. তোফায়েল, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র, সুশাসন ও সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত, ঢাকা: রাজনৈতিক সংস্কার প্রচারাভিযান, ২০০২।

৪৯ প্রথম আলো ৭ এপ্রিল ২০০৯।

৫০ নয়া দিগন্ত, ৮ এপ্রিল ২০০৯।

৫১ প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৯।

৫২ নয়াদিগন্ত,৮ এপ্রিল ২০০৯।

৫৩ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এ ব্রেল ২০০৯।

৫৪ প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।
৫৫ জাহাঙ্গীর, মুহম্মদ, স্থানীয় সরকার বিতর্ক: উপজেলা নিয়ে আলোচনা হোক, প্রথম আলো, ১২ মার্চ ২০০২।
৫৬ আবেদ, ফজলে হাসান, বিশেষ সাক্ষাতকার, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষমতাবান স্থানীয় সরকার প্রয়োজন, ১৯ এপ্রিল ২০০৯।
৫৭ আলী, এএমএম শওকত, দিন বদলের পাঁচালী, প্রথম আলো ১০ মে ২০০৯।
৫৮ New Nation, 7may 2009.
৫৯ যুগান্তর,৭মে ২০০৯।
৬০ সমকাল, ৮ এপ্রিল ২০০৯।
৬১ প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০০৯।
৬২ নয়াদিগন্ত, ৫ এপ্রিল ০৯।
৬৩ নয়াদিগন্ত, ১০ এপ্রিল ২০০৯।
৬৪ প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৯।
৬৫ প্রথম আলো, ৭ মে ২০০৯।
৬৬ বিস্তরিত পাঠের জন্য প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০০৯।
৬৭ আমার দেশ, ৭ মে ২০০৯।
৬৮ প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০০৯।
৬৯ সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৯।
৭০ যুগান্তর, ২৫ মার্চ ২০০৯।
৭১ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল২০০৯।
৭২ যুগান্তর, ৭ এপ্রিল ২০০৯।
৭৩ প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয় রী ২০০৯।
৭৪ প্রথম আলো, ৩০ মার্চ ২০০৯।
৭৫ New Nation, 7 May 2009.
৭৬ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ২০০৯।
৭৭ ভুঁইয়া, মোঃ শাহজাহান হাফেজ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকবণ ও উপজেলা: একটি পর্যালোচনা, The Journal of Locl Government, vol. 27, No.1, 1998, P.61
৭৮ সরকার, গৌতম কুমার, উপজেলার সুখ-দুঃখ ও সংকট নিরসণের উপায়, রাজশাহী : জননী প্রকাশনী, ১৯৮৮. পৃ. ৮২।
৭৯ আহমেদ, তোফায়েল, বিকেন্দ্রীকরণ মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার- একুশ শতকের জন প্রশাসন সংস্কার ভাবনা, ঢাকা: গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ১৯৯৯, পৃ: ৪১।
৮০ রহমান, মোঃ মকসুদুর, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৩. পৃ.২৮৯।
৮১ Henny Maddick, Democracy, Decentrlization and Development, Bomby: Asia Publishing House, 1963, P. 26.